International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XI, Issue-VI, November 2025, Page No. 22-30
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.11.issue.06W.152

বাংলার প্রথাসিদ্ধ সংস্কার: চড়ক-গোষ্ট

পল্লবী সরদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিকম স্কীলস্ ইউনিভার্সিটি, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভুম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ড. অনাথবন্ধু চ্যাটার্জী
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, সিকম স্কীলস ইউনিভার্সিটি, শান্তিনিকেতন, বীরভুম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 06.11.2025; Accepted: 12.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

There are various primitive reforms and contemporary socio-economic reasons behind the celebration of various folk festivals cherished by mythological traditions. Most of the inhabited rural areas of Bengal are agricultural regions. Since the month of Chaitra is the end of the year, Bengali farming family's hand over the lion's share of their annual harvest or crops to the king, moneylender or landlord. After completing all the debts/financial transactions and settlements of the entire year, at the beginning of the month of Baishakh, poor farmers or people of the lower classes participate in this Charak Gajan festival with the dream of leaving behind the experiences gained in the previous year and living in a healthy, beautiful and safe way in the future. In our Bengali society, or any community, at the beginning of any auspicious or inauspicious event, puja-paath, homa-yogni etc. are performed. In fact, this rule was created by our great-grandfathers, if we want to complete any work, we have to please the supernatural being out of loyalty to him and through the appeasement of that power, all our worldly tasks will be accomplished, it has been believed for ages. Similarly, this Charak Goshta festival is also celebrated year after year.

Just as there is a primitive socio-economic context behind this festival; similarly, various myths of remote rural areas are associated with this festival. Various stories of the king of the Antyajas are circulated among the people. In this social festival, it can be observed that the so-called lower caste or Antyaja class people are predominant. Which is an unimaginable scene in our flood-ridden society. Upper caste people are not seen at all observing customs like jumping on thorns, eating ghurnipak on the Charak tree, and making banforda. It is clear that the caste system does not wait to understand such events that are carried out in conjunction with the internal conflicts of the society. The truth is that the lower castes should observe whatever customs are risky; the upper castes should be safe! What is the harm if one day they have to bow down to the lower castes for that? Rather, they (the lower castes) will be satisfied with this small obedience. This society has always moved forward based on the idea of self-interest.

Keywords: Awakening the tree, Chaitra Sankranti, Del Sannyasi, Patphul, Spirit worship, Class conflict.

ভূমিকা:

বহু প্রাচীন ঐতিহ্য লালিত সংস্কার কেন্দ্রিক বাংলার লৌকিক পার্বণ তথা উৎসব চড়ক গোষ্ঠ। চৈত্র শেষে এই প্রথা মানা হয় বলে একে 'চৈতে গাজন' বলে। এই উৎসবের উপাস্য দেবতা হলেন শিব। চড়ক গাছে ঘূর্ণিপাক খাওয়ার এই উৎসব যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায়, অংশগ্রহনকারিরা প্রায় সকলেই উচ্চবৃত্তীয় শ্রেণীর বদলে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা পালন করেন, ফলত শ্রেণী বৈষম্যের একটি বিশেষ দিক প্রকাশ পাচ্ছে এই সংস্কারের ক্ষেত্রে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে এই উৎসব ভিন্ন ভিন্ন নামে পালিত হয়ে থাকে, উত্তরবঙ্গে একে 'গম্ভীরা' বলা হয়, পূর্ববঙ্গে 'চড়ক', রাঢ় বাংলায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে একে 'গাজন' নামে অভিহিত করা হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলার অন্যতম প্রাচীন লোক উৎসব চড়ক-গাজন, চৈত্র মাসের শেষ দিন এটি পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জের মানুষেরা একে 'চৈতে গাজন' বলে থাকেন। হিন্দুদের প্রতিটি লৌকিক উৎসবের প্রেক্ষাপটে একজন দেবদেবীর মহিমা লালিত হয়। এই অনুষ্ঠান মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের শৈব ধর্মালম্বী নিম্নবর্নীয় শ্রেণীর উৎসব। অন্য মতানুসারে, হিন্দু ধর্মে বাণ রাজার শিব-তপস্যার অনুরূপ বলে কথিত আছে। বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে চৈত্র মাস হল বছরের শেষ, একে 'মহাবিষুব' বা 'চৈত্র সংক্রান্তি' বলা হয়ে থাকে। 'চড়ক' শব্দটি থেকে 'চক্র' বা 'চক্রাবর্ত' কথাটির সামঞ্জস্য রয়েছে এবং 'গাজন' শব্দটির মধ্যে গাঁ-জনের উৎসব বা গাঁয়ের একাধিক জনের মিলিত আয়োজিত অনুষ্ঠানকে, একই রকম ভাবে 'গোষ্ট' কথাটি থেকে গোষ্ঠী বা একত্র থাকার মেল-বন্ধনের প্রথাটি এখানে প্রতীকীরূপ বহন করছে অনুমান করা যেতে পারে। সুতরাং কিছু গবেষক ও পন্ডিতগণের মতে চড়ক গাছকে কেন্দ্র করে বহু পুণ্যার্থীর শূন্যে বৃত্তাকারে আবর্তন করার রীতিকে বর্ষান্তের অবসরে সৌরচক্রের সমাপ্তির প্রতীক রূপে গণ্য করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলে এই পূজাটি বিভিন্ন নামে পরিচিত উত্তরবঙ্গে একে 'গম্ভীরা' বলা হয়, পূর্ববঙ্গে এর নাম 'চড়ক', রাঢ় বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে একে 'গাজন' নামে চিহ্নিত করা হয় এছাড়াও নীল, গোষ্ট, সাহী যাত্রা, দেল ইত্যাদি আঞ্চলিক নামেও এই উৎসব বা পার্বন পরিচিত। এই দিনে ঘরোয়া ভাবে কয়েকটি মেয়েলি ব্রত পালিত হয় বাংলার বহু জায়গায় যেমন-মধু সংক্রান্তি, নিত সিঁদুর, ক্রয় সংক্রান্তি প্রভৃতি।

ঐতিহ্য সমন্বিত যে কোনো লোক উৎসবের প্রেক্ষাপটে রয়েছে নানান আদিম সংস্কার তথা সমসাময়িক অর্থসামাজিক কারণ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলগুলি কৃষি প্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত। চৈত্র সংক্রান্তির শেষ দিন বাঙালি কৃষক পরিবার তাদের চাষের সিংহভাগ খাজনা স্বরূপ রাজা, মহাজন, জমিদারদের হস্তাগত করে সারাবছরের সমস্ত আর্থিক লেনদেন ও হিসেব-নিকেশ সম্পূর্ণ করেন এবং নববর্ষের শুরুতে অর্থাৎ বৈশাখ মাসের সূচনা কালে পুরনো বছরের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে পিছনে ফেলে আগামী দিনগুলো যাতে সুস্থ সুন্দরভাবে বাঁচা যায় তারই স্বপ্ন নিয়ে এই উৎসবে মেতে ওঠেন বাঙালির অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা।

চড়ক গাজন উৎসবের মূল উপাস্য দেবতা হলেন শিব। এ প্রসঙ্গে রাঢ় বাংলায় একটি পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, অন্ত্যজ শ্রেণীর রাজা বানের কন্যা উষার সঙ্গে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধর প্রেম প্রণয়ন ঘটে। উষা ও অনিরুদ্ধর এই সম্পর্ক বান রাজা মেনে না নেওয়ার ফলে অনিরুদ্ধকে হত্যা করতে উদ্ধত হলে দ্বারকা ধীশ কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে রাজা ক্ষতবিক্ষত হয়। মৃত্যুর আগে বান কৃষ্ণের কাছে একটি বর লাভ করেন যেহেতু অন্ত্যজ কন্যা উষার সন্ততিরা কৃষ্ণের বংশধরের জননী হবেন তাই বছরের ঐ দিনটি তাঁর পিতৃ গোষ্ঠীর মানুষেরা হবেন সকলেরই পূজ্য।

অন্য মতানুসারে, বান রাজা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হয়ে মহাদেবের প্রীতি অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষায় ভক্তিসূচক নৃত্য-গীতি ও নিজ গাত্ররক্ত দ্বারা শিবকে তুষ্ট করে নিজ অভিষ্ট সিদ্ধ করেন। সেই দিনটি উজ্জাপন সূচক শৈব সম্প্রদায়ের ভক্তরা শিবের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য উৎসব করে থাকেন।[১]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চড়ক পূজা:

সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ চৈত্র গাজন উপলক্ষে নানাবিধ আচার-আচরণের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করে থাকেন। এই পূজার বিশেষ অঙ্গ হল নীলপূজা। কৃষি প্রধান বাংলায় শৈব ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় একমাস ধরে নিজ গোত্র পরিত্যাগ করে শিবের গোত্র নিয়ে এক কঠোর অনুশাসনে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করেন। চৈত্র সংক্রান্তির পাঁচ দিন আগে থেকে চলে শিবের পূজা। নীলষষ্ঠীর দিনটি শিব পার্বতীর বিয়ের দিন মনে করা হয় এবং সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় বসানো হয় চড়ক গাছ। শাল গাছের একটি কাণ্ড বা গুঁড়ি সারা বছর সান বাঁধানো কোন এক পবিত্র পুকুরের জলে ডুবে থাকে, সংক্রান্তির আগের দিন ভক্তরা ঢাক-ঢোল, কাঁসা, ঘন্টা, শঙ্খ ও উলুধ্বনিসহ মঙ্গোলসূচক বাদ্য-ধ্বনি সহকারে গাছের গুঁড়িটি তোলেন এবং কান্ডটিকে ভালোভাবে তেল, হলুদ, সিঁদুর মাখিয়ে ফাঁকা মাঠের মাঝ বরাবর গ্রথিত করেন এবং ভক্তগণেরা সকলে বলে ওঠেন- 'পার্বতী পরাননাথ বহো', এই প্রথাটি কে বলা হয়- 'গাছ জাগানো'। শাল গাছের এই গুঁড়িটিকে লৌকিক ভাষায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা 'বুড়ো শিব' নামেও আখ্যায়িত করেন। শাল গাছের গুঁড়িটি এখানে শিবের প্রতীক এবং পার্বতী হল উর্বরতা কামনার প্রতীক বহন করছে। এই উৎসবের ভিত্তি হল উর্বরতা সংস্কৃতির মিশ্রণে প্রাচীন কৃষি প্রধান সমাজের বিশ্বাস ও ধারণা সমন্বিত। এছাড়াও আরও একটি কারণ হল সূর্যের তাপকে যাদুশক্তি দ্বারা অনুকূল জলবায়ুতে রূপান্তরিত করা। বর্তমান সমাজের মানুষ বিশ্বাস করেন যে যাদুবিদ্যা, তন্ত্রবিদ্যা, উপবাস, আত্মিক কৃচ্ছসাধন ইত্যাদির মাধ্যমে জাগতিক নানা পার্থিব জিনিস কে আয়ত্ত করা যায়। সেইরকম ভাবেই জমির উর্বরতা বাড়ানো সম্ভব এই আশায় বর্ষ শেষে সংক্রান্তির এই পূজা পার্বণে মেতে ওঠেন বাংলার গ্রামবাসীবৃন্দ।

চৈত্র সংক্রান্তির তৃতীয়-চতুর্থ প্রহরে চড়ক গাছের পূজার আয়োজন শুরু হয়, পুরোহিত এই পূজার পৌরাহিত্য করে থাকেন। বিভিন্ন গ্রামের সন্ন্যাসীরা ও গ্রামবাসীবৃন্দদের ভিড় জমতে শুরু হয়, এছাড়া সারা মাঠ জুড়ে মেলাও বসে একে 'চড়ক মেলা' বলা হয়। সাহসী ছেলে-ছোকরারা চড়ক গাছের দুই দিকে ঝুলন্ত দড়িতে নিজেদের বেঁধে ঘূর্ণিপাক খায়, একে 'চরকি পাক' খাওয়া বলে, অঞ্চল বিশেষে দেল সন্ন্যাসীদের অনেকেই আবার মেরুদন্ডে লৌহ কাঁটা বিধিয়ে চড়কি পাখ খায়, এইরূঝাঁপ লোমহর্ষকর ঘটনা ঘটে থাকে বাংলার বহু জায়গায় চড়ক পূজার সময়।[২]

গাজন:

বাংলার লোকায়ত ঐতিহ্যবাহী উৎসব গাজন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে অনেকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বা উত্তরীয় নেন তারপর হয় নীল পুজা এবং সর্বশেষ চড়ক গোষ্ঠ হয়ে সংক্রান্তি শেষ হয়। গাজন শব্দের বুৎপত্তিগত উৎপত্তি নিয়ে নানান মতভেদ দেখা যায়, গাজনের বিভিন্ন আচার-বিধি ও নিয়মানুচার নির্দেশ করে আদিম যাদু-বিশ্বাসের একটি উত্তরসূরী। চৈতে গাজনের প্রাথমিক অনুষ্ঠান হল 'দেল' গঠন করা। এই 'দেল' বা 'দল' কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সম-মতাদর্শ বিশিষ্ট মানুষের একত্রে সহাবস্থান করা। 'দল' শব্দের বর্ণ বিপর্যস্ত উচ্চারণই 'দেল' শব্দের উৎপত্তি বা কোন কোন গবেষকের মতে 'দেউল' শব্দ থেকে 'দেল' কথাটি এসেছে। গ্রামের কিছু মানুষের তত্ত্বাবধায় ইচ্ছুক যুবক-কিশোরদের নিয়ে একটি পাঁচ, সাত, নয় বা ততোধিক জনের গাজন সন্ন্যাসীর 'দল' বা 'গাজন দেল' তৈরি করা হয়। এই গাজন দলের প্রত্যেকে শৈবধর্ম অনুসারে 'শিব ধর্ম' গ্রহণ করেন এবং ধর্ম গ্রহণের সময় শিবানুরাগী ভক্তবৃন্দ উত্তরীয় ধারণের সময় বলেন–

> 'স্বধর্ম পরিত্যাজ্য, শিবধর্ম শিরোধার্য'

বিশিষ্ট লোক সাহিত্যিক কেশব আড়ুর মতে-

> "সতীর দেহত্যাগের পর মায়ের মৃত্যুর অশৌচ পালনের জন্য সন্তানেরা তথা ভক্তগন এই ব্রত পালন করে আসছে। এটি লোকাচারের প্রেক্ষিতে গাজনে রূপান্তরিত হয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রে মৃত ব্যক্তির পরলৌকিক ক্রিয়াসূচক যে অশৌচ মানা হয় একমাস বা পনেরো দিন বা তেরো দিন ধরে। এই রীতিই এখানে প্রকাশ পেয়েছে বা অনুকরণ করা হয়েছে।"

এইসময় ভক্তরা সন্ন্যাসীদের মত ধুতি পরে, গলায় সুতোগুচ্ছের উত্তরীয় ধারণ করে, দিবালোকে আহার গ্রহণ করে না, সন্ধ্যাকালে স্নান করে নানান ফুল-ফল (আম, কলা, দুধ, ধুতুরা, আকন্দ, কল্কে, সিদ্ধি ইত্যাদি) মাটির ভাঁড়ে জল সহযোগে শিব-সতীর উদ্দেশ্যে 'ওড়কি' (ঢালু বেদি) তে ঢেলে প্রণাম করে। তারপর হবিষ্যান্ন, ফল, দুধ ইত্যাদি আহার হিসেবে গ্রহণ করে। এই রীতি চলতে থাকে কোথাও পনেরো দিন বা এক মাস বা বারো দিন ধরে, শেষদিন সন্ন্যাসীগণ মস্তকমুণ্ডন করে আবার সংসারিক জীবনে প্রবেশ করেন এবং সেই সময় তারা উত্তরীয় পরিত্যাগ করার সময় বলেন–

'শিবধর্ম পরিত্যাজ্য স্বধর্ম শিরোধার্য'

ভক্তগণেরা চৈত্র সংক্রান্তি শেষে ১লা বৈশাখের দিনে সারাদিন শিবের জয়ধ্বনি দিতে থাকে এবং শিব সতীর নাম জপ করেন সমবেত ভাবে-

"বাবা বুড়ো শিবের চরণে সেবা লাগে, মহাদেব!"

অথবা

"বাবা তারকেশ্বরের চরনে সেবা লাগে, মহাদেব!"

অথবা

"বাবা ধর্ম নিরঞ্জনের চরনে সেবা লাগে বাবা মহাদেব
কাশী বিশ্বেশ্বরের চরণে সেবা লাগে বাবা মহাদেব
কৈলাস পতির চরণে সেবা লাগে বাবা মহাদেব। ব্যোম ব্যোম..."

উপরিক্ত জয়ধ্বনির মাধ্যমে সম্পূর্ণ বোঝা যাচ্ছে যে শিব ও ধর্ম এক ও অভিন্ন কারণ, শিব নাম গান শেষে 'ব্যোম ব্যোম' ধ্বনি বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। 'ব্যোম' অর্থাৎ শূন্য যা কিনা পঞ্চভুতের শেষ ভূত। পঞ্চভূত অর্থে- ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এদের একমাত্র অধিপতি হলেন ভূতনাথ মহাকাল বা দেবাদিদেব শিব। ফলত বৈষ্ণব সেবকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল জীবনদশার অন্তিমে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হওয়া, ব্রাহ্মসেবকদের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি তেমনি শিব সেবকদের অন্তিম ইচ্ছা শিবলোক প্রাপ্ত হওয়া। তাই নিম্নবৃত্ত অন্তজ্য শ্রেণীর মানুষেরা এই আচারায়নের মাধ্যমে তাদের পূজার রীতিনীতি শেষ করেন এবং শিবলোক প্রাপ্তির অন্তিম ইচ্ছা স্বরূপ সাধনমার্গে প্রবেশ করেন।[৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চৈত্র সংক্রান্তির পাঁচ দিন আগে থেকে দেল সন্ন্যাসীরা কিছু নিয়ম বা খেলার ছলে বিশেষ রীতি পালন করে থাকেন, সেগুলি হল- ১) শিবের পাড়া ঘোরা বা ধুল খেলা, ২) ঝাঁপ খেলা, ৩) নীলের বাতি, ৪) কুমির পূজা, ৫) কাকবলি প্রথা, ৬) ভুন্নুঘর, ৭) ঠাকুর চুরি, ৮) আগুন ঝাঁপ, ৯) চরক পূজা, ১০) বানফোঁড়া, ১১) চরক বিদায়, ১২) দেল সন্ন্যাসির নিয়মভঙ্গ।

শিবের পাড়া ঘোরা বা ধুল খেলা:

দেল সন্ন্যাসীগণ শিব ঠাকুরের একটি মূর্তি নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় জয়ধ্বনি দেন ও ঘুরে বেড়ান। সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজনের কাছে ঠাকুর থাকে এবং অপরজনের কাছে শিবের থানের সিঁদুর মাখানো ধুলো মাটি থাকে, সন্ন্যাসীদের সাথে পাড়ার বালক, বালিকা, কিশোর, কিশোরী ও গ্রামবাসী বৃন্দের অনেকেই থাকেন, ছেলে-ছোকরার দল কালি ঝুলি মেখে ভূত-প্রেত সাজে এবং ভুতুড়ে আচরণ করে। তাদের হাতে থাকে স্বপত্র গাছের ভাঙা ডাল-পালা এবং মেয়েদের বা কিশোরীদের হাতে থাকে শাঁখ, ঘন্টা, কাঁসা ইত্যাদি মঙ্গলসূচক বাদ্যযন্ত্র। সন্ন্যাসী দলের একজন বলিষ্ঠ যুবক ফলমূল, চাল, আলু, পয়সা, বাতাসা ইত্যাদি আদায়ের জন্য একটি ধামা ধরে থাকেন, এরা পাড়া ঘুরতে ঘুরতে গৃহস্থ বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং উচ্চস্বরে শিবের জয়ধ্বনি দিয়ে বলেন–

"শিব যায় রঙ্গে, পার্বতী যায় সঙ্গে
বলো শিব রাম রাম
ত্রিশূলধারী চরণের সেবা লাগে বাবা মহাদেব, ব্যোম ব্যোম!

জটাধারী চরণের সেবা লাগে বাবা মহাদেব, ব্যোম ব্যোম!
তারকেশ্বরের চরণে সেবা লাগে বাবা মহাদেব, ব্যোম ব্যোম! ...”

শিবের এই জয়ধ্বনির সাথে সাথে গৃহস্থের ঠাকুর থানের সিঁদুর মাখানো ধুলো মাটি ছড়িয়ে দেয় বলে একে ‘ধুল খেলা’ বলা হয়। দলের দুজন হর-পার্বতী সাজেন এবং তারা নাচ-গান করেন সঙ্গে শিবের অনুচর রূপে ভূত-প্রেত সাজা ছেলে ছোকরার দলও নাচানাচি শুরু করে। অনেকে গৃহস্থ্য বাড়ির আঙিনায় জল ঢেলে কাদা মাটি খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে। এটি চলে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং ২৭ শে চৈএ অবধি, শিবের পাড়া ঘোরানো হয়।[৪]

ঝাঁপ খেলা:

২৮ শে চৈত্র থেকে এই উৎসব পালিত হয় আঞ্চলিক ভাষায় একে হাট সন্ন্যাসের মেলাও বলা হয়। দেল সন্ন্যাসীরা যে যার শিব থান থেকে ঠাকুর পূজা করে মাঠের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। দেলের একজন ঘটিতে গঙ্গাজল কুশের কাঠি করে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে যায় পথ পবিত্র করার জন্য, তার পিছনে থাকে একজন সন্ন্যাসী যিনি মাথায় করে ঠাকুর নিয়ে যান এবং সঙ্গে গ্রামবাসী বৃন্দ ও মহিলাগন মঙ্গল বাদ্য বাজিয়ে শিবধ্বনী দিতে থাকেন, একে ‘দেল যাত্রা’ বলা হয়। সন্ন্যাসীর দল তাদের ঠাকুর নিয়ে মাঠে উপস্থিত হওয়ার পর ছোট চৌকির উপর শিবের নুড়ি শিলা দুধ গঙ্গাজলের পাত্রে বসিয়ে রাখেন। মাঠে একটি ‘তারাভাড়া’ বাঁধা হয়, এটি হলো দুদিকে দুটো শক্ত খুঁটি পুঁতে টুকরো বাঁশ দিয়ে একটি সিঁড়ির মতো করে চার থেকে পাঁচ ফুট তফাতে ভাগ করা হয় এটিকে আঞ্চলিক ভাষায় ‘ভাড়া’ বলে। নিচে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয় বঁটি যার ওপর দেল সন্ন্যাসীরা ওই ভাড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন, এটি ‘ঝাঁপ’ উৎসব নামে খ্যাত। মূলত এরূপ ঘটনার নেপথ্য কাহিনী হল, হিন্দু পুরাণ কথিত বাণ রাজা শিবকে তুষ্ট করতে নিজের প্রান বিপন্ন করে মধ্যভারতের ‘খাউ’ নামে একটি পর্বতশৃঙ্গ থেকে শিব নাম উচ্চারণ করতে করতে কাঁটায় পরিপূর্ণ উপত্যাকার উপর ঝাঁপ দেন, কিন্তু শিবের আশীর্বাদে তাঁর প্রান রক্ষা পায় ও রাজার অভীষ্টও সিদ্ধ হয়। এই কাহিনির প্রেক্ষিত অনুসারে নিম্নবর্ণের মানুষেরা সন্ন্যাসী বেশ ধারন করেন ও নিজ নিজ মনস্কামনা পূরণের জন্য ঝাঁপ উৎসব পালন করেন।

সন্ন্যাসীরা যে বঁটির উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আঞ্চলিক ভাষায় তাকে ‘পাটফুল’ বলা হয়।পাতলা লোহার পাটপাতা সাদ্রীশ যুগ্ম ফলা পরপর তিনটি বা পাঁচটি একটি বেল কাঠ বা কলাগাছের কান্ডের সাথে যুক্ত করে আটকে দেওয়া হয়, একে পাট পত্রের সাদৃশ দেখার কারণে পাটফুল নামকরণ হয়েছে। সন্ন্যাসীদের একে একে ঝাঁপ চলতে থাকে এবং সর্বশেষ ঝাঁপ খেলা শেষ হলে ঠাকুর নিয়ে সন্ন্যাসীগণ মাঠ ত্যাগ করেন ও ফিরে যান যে যার মন্দির প্রাঙ্গণে এবং ঠাকুর রেখে নিজেরা স্নান সেরে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে বিশ্রাম নেন।[৫]

নীলের বাতি:

নীল ষষ্ঠী ব্রত অনুষ্ঠানে মহিলারাই অংশগ্রহণ করেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে নীল চন্ডীর সঙ্গে শিব ঠাকুরের বিয়ে হয়েছিল এমনটা মানা হয়। সংক্রান্তির আগের দিন শিব ঠাকুরকে স্বামী রূপে পাওয়ার জন্য এই ব্রত পালন করে থাকে গ্রামীণ মেয়েরা। এছাড়া দেবী পার্বতী ও ষষ্ঠী যেহেতু এক অঙ্গে অবিচ্ছিন্ন রূপ তাই একে নীল ষষ্ঠীর ব্রতও বলা হয়। গ্রামবাংলায় প্রচলিত অর্থে ষষ্ঠীদেবী হলেন সন্তান রক্ষক দেবী, তাই বহু মায়েরাও নিজেদের সংসার ও সন্তানের মঙ্গলকামনার্থে এই ব্রত পালন করে থাকেন। বিকেল বা সন্ধ্যাবেলায় নীল দেবতার থানে বাতি জ্বালে ও নিজেদের ঠাকুর ঘরের সামনে বাতি জ্বেলে উপবাস ভঙ্গ করে ও এই ব্রত পালন করে।[৬]

কুমির পূজা:

নীল পূজার সকালে অর্থাৎ ২৯এ চৈত্র শিবের থানের সামনে কাদা মাটি দিয়ে একটি কুমিরের প্রতিকৃত তৈরি করা হয়। ওই কুমিরের গায়ের শিরারেখা বানানোর জন্য দেল সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন খেঁজুর গাছের কাঁটা উপেক্ষা করে গাছের মাথায় উঠে একটি খেঁজুরের কাঁদি না কেটে টেনে ছিঁড়ে আনেন ও সেই কাঁদির খেঁজুর দিয়ে কুমিরের

গায়ের শিরারেখা বানানো হয়। পরে দ্বিপ্রহরে আতপ চাল, ফলমূল প্রভৃতি ডালা সাজিয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূজা শুরু করেন গ্রামের মহিলারা একত্রিত হয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন নিজেদের সংসার ও সন্তানের মঙ্গলকামনার্থে।

এই সংস্কারটি মূলত আদিম সংস্কারে বসবর্তি। সেই সময় প্রকৃতি যাকে ভয় পেয়েছে এবং যে শক্তির আধিক্য অধিক বোধ করেছেন তাকে তুষ্ট রাখতে আদিম মানুষেরা স্বীকার্য পশুর দেহের ভালো অংশটা অর্ঘ্য রূপে প্রদান করেছেন। জলা-জঙ্গলাকীর্ণ বনভূমিতে তিন কালান্তক প্রাণী হল, জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ ও সাপ, ফলত প্রাণের ভয় বা জীবন রক্ষার্থে সেই সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমাজ বিবর্তন ঘটেছে এ কথা ঠিক, কিন্তু প্রাণ রক্ষার তাগিদ অথবা বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবনযাপন অতিবাহিত করার জন্য এই তিন প্রাণীর নিয়ন্ত্রক তিন মনুষ্যবোয়বের পুরুষ ও নারী দেবতা কল্পনা করা হয়েছে, যা বাঘের দেবতা হিসেবে দক্ষিণ রায়কে পূজা করা হয়, সাপের দেবতা হিসেবে মা মনসাকে, এবং কুমীরের দেবতা হিসেবে কালুরায়কে লৌকিক দেবদেবী মতে আরাধনা করা হয়। বাংলার বহু গ্রামেগঞ্জে দক্ষিণ রায় ও কালুরায় ধর্মঠাকুর নামে ও পূজিত হয় তাই শিব ও ধর্ম ঠাকুর অভিন্ন হওয়ায় শিবের গাজনে কুমিরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।[৭]

কাকবলি প্রথা:

চৈত্র মাসে নীল পূজার দিন এই 'কাকবলি' পালিত হয়। 'কাকবলি' কথার তাৎপর্য হলো 'কাক' যা প্রেতাত্মার প্রতিভু বলে লোকসংস্কার রয়েছে। মৃত মানুষের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উৎসর্গকৃত খাবার কাক গ্রহণ করে অর্ঘ্য রূপে। বলি প্রথার অর্থ 'কর' বা 'রাজকর' বোঝানো হচ্ছে যা বাধ্যতামূলক। সন্ধ্যাকালে দেল সন্ন্যাসীগণ শ্মশানে উপস্থিত হন এবং ভূতেদের নৈশভোজের জন্য আমন্ত্রণ জানান, এটি প্রেত বিশ্বাস কেন্দ্রিক যাদুবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত 'প্রেত পূজা'। ভূতভোজনের জন্য মালসায় অন্নপাক্ করা হয় শোল মাছ বা যেকোনো বিল মাছ পোঁড়া, নানাবিধ ফল, সিদ্ধি, গাঁজা, গুঁড়-অম্বল ইত্যাদি সহযোগে প্রেতলোকের উদ্দেশ্যে সেটি নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এই কাজটি সম্পন্ন করেন মূল ভক্ত বা সন্ন্যাসী এবং বাকি সন্ন্যাসীরা তাকে ধরে থাকেন পাছে ভূতেরা তাকে না যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ভুত নিমন্ত্রণ করে পিছনে

এই প্রথাটি আদিম কুসংস্কার আচ্ছন্ন রীতির বার্তা বহন করছে। প্রেতাত্মারূপে পূর্বপুরুষের কথাই এই নিয়মের দ্বারা এক প্রকার পালন করা হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে শ্মশানচারী শিবের অনুচর ভুত-প্রেতদেরকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী রূপে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। ভুত ভোজনের আরো একটি দার্শনিক কারণ অনুধাবন করা যায় তা হলো জীবন ও মৃত্যুর একটি সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, জীবন হলো প্রবাহমান সত্য যার মধ্যে আলোর কণা পাতিত হলে দেহ প্রতিভাত হয় কিন্তু মৃত্যু জীবনের প্রতিবিম্ব বা চিরঅন্ধকারময় অতীত। জীবনের আনাগোনা চলে আলোর মধ্যে এবং মরন চিরঅন্ধকার বা কল্পিত শ্মশানভূমি। এই স্থানে সাক্ষাৎ ঘটে উত্তর পুরুষের সাথে মৃত পূর্বপুরুষের কল্পনার এবং এই দুই লোকের দেবতা হলেন ভূতনাথ শিব। ভূত নিমন্ত্রণ বা ভূত ভোজনের মধ্য দিয়ে ইহলোক এবং পরলোকের একটি সংযোগ স্থাপন করা হয় যা অখন্ড জীবন সত্যকে প্রতিভাত করা হয়েছে।[৮]

ভুন্নুঘর:

২৯এ চৈত্র নীল পূজার রাতকে ভুন্নুঘর বলা হয়। বাংলায় এটি একটি আঞ্চলিক শব্দ যা কিনা ভূতের বা ভূতনাথের ঘর এই অর্থে 'ভুন্নঘর' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি সৃষ্টিকর্তা শিব এক অর্থে জ্যোতির্ময় ও অন্য অর্থে মহাকাল অর্থাৎ দিন ও রাতের অধিপতি তাই তার সন্তান বা অনুচর ভক্তদের পিতার রাজ্যে সকল বস্তুর উপর সমান অধিকার রয়েছে। এই বিশ্বাসের দরুন ভুন্নুঘর রাতে দেল সন্ন্যাসীরা সারা রাত জেগে কাটিয়ে দেন বা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান। ভূত ভোজন সম্পন্ন করে দেল সন্ন্যাসীরা পূজাস্থলে ফিরে এসে ক্ষুধা নিবারণের জন্য তারা যেখানে যত ফল বাগান আছে সেখান থেকে যা ইচ্ছা হয় ফলভোজন করে। ওইদিনের জন্য কারোর জিনিস না বলে নেওয়াকে কেউ চুরি বলে না, এটিকে সাংস্কৃতিক অংশ হিসেবে ধরা হয়। ভুন্নুঘরের এই রাতটি দেল সন্ন্যাসীদের কাছে একটি স্বার্থময় জগত বা ব্যাক্তি মালিকানাধীন মুক্ত অঞ্চল বলে মানা হয়। এই সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আদি নৃগোষ্ঠীর একত্রে থাকার ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঠাকুর চুরি:

এটি একটি লৌকিক ক্রীড়া নীল পূজার রাতে এই অনুষ্ঠানটি পালন হয়ে থাকে। ভুন্নুঘরের দেল সন্ন্যাসীগনের একজন ঠাকুর পাহারায় থাকেন অন্যরা গ্রামে ঘুরে বেড়ান। যিনি ঠাকুর পাহারায় থাকেন তার নজর এড়িয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা নিশি জাগরণকারী তাদের মধ্যে কেউ একজন ঠাকুর চুরি করে অপুত্রক রমণী বা মৃতবৎসার কাছে দেন, প্রচলিত লোক বিশ্বাস ওই ঠাকুর অপুত্রক মায়ের কোলে দিলে তার সন্তান লাভ ঘটবে ও সংসারের মঙ্গল হবে। যদিও সংক্রান্তির সকালে ওই ঠাকুর ফিরিয়ে দেওয়া হয় মন্দিরে।

এই ঠাকুরচুরি রাতজাগা সন্ন্যাসীদের কাছে বিনোদনের বিষয়রূপ। লৌকিক সংস্কার মতে ঠাকুরকে একটি স্থানে লুকিয়ে রাখা হয় এবং সকলে সেই ঠাকুরকে খুঁজতে থাকেন ও জয়ধ্বনি দেন- 'ঠাকুর কোথায় গেল'/'কে ঠাকুরকে নিয়ে গেল' ইত্যাদি বলে চিৎকার করেন এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লৌকিক অনুষ্ঠানটি পালিত হয়।[৯]

আগুন ঝাঁপ:

দেল সান্ন্যাসীগণ চরক গাছ জাগানর পর শুরু করেন বুড়ো শিবের থানে ঝাপের ভারা বাঁধা। ভারার নিচে ঠাকুর রেখে ব্রাহ্মণ পুজো করেন। পুজো শেষ হলে হোমারতি শুরু হয়। এর পরই ব্রাহ্মণ হেমকুণ্ডের আগুন নিয়ে ভাড়ার নিচে খড়ের আগুন জ্বালেন, এবং শিবের ভক্তরা একে একে ভাড়া থেকে দল খেতে খেতে আগুনের তাপ লাগিয়ে নিজ দেহ মন শুদ্ধ ও পবিত্র করেন। স্থানীয় বা লৌকিক ভাষায় একে 'আগুন ঝাঁপ' বলা হয়।

শিবভক্তদের তাপ গ্রহন শেষ হলে শুরু হয় 'অগ্নিপরীক্ষা'। ভারার সামনে আগুন জ্বালা হয় এবং তার পাশে দুধের পাত্র থাকে, দেল সন্ন্যাসীরা দুধের পাত্রে পা ডুবিয়ে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে ভারায় ওঠেন। ভারায় উঠে আবার বঁটির উপর ঝাঁপ দেন। এইভাবে ক্রমে সন্ন্যাসীগনের ঝাঁপ ও শেষে মূল সন্ন্যাসির ঝাঁপ অন্তে 'আগ্নিপরিক্ষা' অনুষ্ঠানটি শেষ হয় চৈত্র সংক্রান্তির প্রথম দুই প্রহরের মধ্যে।

শিবের উপাসনা কেন্দ্রিক এই আগুন খেলা মূলত সূর্য পুজাকেন্দ্রিক সংস্কার বা বৈদিক ব্রাহ্মন্য সংস্কৃতির সমন্বয় বলা যেতে পারে। সমাজ বিবর্তনের ধারায় সংস্কৃতির এই বিশ্লেষণের ধারাকে লোক সংস্কৃতির পরিভাষায় বলা হয় 'অ্যাকালচারেশন' বা 'সাংস্কৃতিক সমন্বয়'। তাই শিবকে আগ্নি, আকাশ, সূর্য, মহাকাল, আদিদেব ইত্যাদি রূপ কল্পনা করা হয়েছে।

বানফোঁড়া:

অন্ত্যজ শ্রেণীর আত্মত্যাগ কেন্দ্রিক প্রথার মধ্যে অন্যতম বানফোঁড়া একটি মর্মান্তিক সংস্কারকে বহন করছে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন দেল সন্ন্যাসীরা নিজেদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে (জিব, নাক, মেরুদন্ডে) লৌহ শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করতো বা ফুঁড়তো এবং চড়ক গাছে নিজেদের ওইভাবে আটকে ঘুর্নী পাক আকারে ঘুরতো। এই ধরনের আচরণ ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করায় যা কিনা বেদ অধ্যয়নকারী, ব্রাহ্মণের প্রতি রূঢ় আচরণকারীর শরীরে লৌহশলাকা বা উত্তপ্ত লৌহদণ্ড বিদ্ধ করা হতো, মনুসংহিতায় এমন শাস্তির কথা জানতে পারা যায়। বাঙালির আবহমান কালের বিশ্বাস কষ্ট করে পূর্ণ অর্জন করা বা পুনর্জনম লাভের আশায় এইরূপ রীতিনীতি পালন হয়ে থাকে, এছাড়া ধনীরা টাকা দিয়ে সন্ন্যাসীদের চড়ককাঠে তুলে চরকি খাওয়াত মজা নেওয়ার জন্য, ফ্যানি পার্কসের ভাষায় এর উদ্দেশ্য হলো – 'প্রক্সি দিয়ে পূর্ণ লাভ'। যদিও ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ছোট লাট বিডন সাহেব এই নির্মম প্রথাটির আইন করে নিষিদ্ধ করেছেন বলে জানা যায়।[১০]

চরক বিদায়:

চৈত্র সংক্রান্তির সন্ধ্যার পর চরকের মেলা ভেঙে যায়। চরক গাছ তলার আগে সামান্য উপাচার ও বিদায়ের মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে পূজা সমাপ্তি করা হয়। দেল সন্ন্যাসীরা ও তাঁদের সহযোগীবৃন্দরা শোভাযাত্রা করে চরক গাছকে নিয়ে উৎসর্গ করা পুকুরে ভাসিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই গাছের গুড়িও পুকুরের মধ্যে কথায় লুকিয়ে যায়, সারাবছরে তাঁর আর কোন সন্ধান থাকেনা বলে লোক বিশ্বাস।

দেল সন্ন্যাসীর নিয়মভঙ্গ:

দেল সন্ন্যাসীগণ চৈত্র সংক্রান্তির কিছু পূর্বে যে শৈব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বিবিধ আচার আচরণ পালন করেন, চরক বিদায়ের পর তারা সেই সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হন। একে বলা হয় 'নিয়মভঙ্গ'। সন্ন্যাসীগন স্নানের পূর্বে উত্তরীয় খুলে জলে ভাসিয়ে দেন এবং বলেন- 'শিবধর্ম পরিত্যাজ্য স্বধর্ম শিরোধার্য'। চৈত্র শেষে ১লা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নববর্ষে তাঁরা স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে আসেন। এই নিয়মের মধ্যে দিয়ে শৈব ধর্মের নিয়মভঙ্গ রূপে মান্যতা পেয়ে আসছে।[১১]

মুল্যায়ন:

চড়ক গোষ্ঠ বহু প্রাচীন লোকোৎসব হলেও উপরিউক্ত আলোচনা মালায় বর্ণিত কাহিনীগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এটি কেবলমাত্র অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের ভূমিকা সমৃদ্ধ লোকাচার, যেখানে উচ্চবিত্তদের কোন অংশীদারি চোখে পড়ছে না। তার কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে কাঁটা ঝাঁপ, বান ফোঁড়া, চড়ক গাছে উঠে 'ঘূর্ণিপাক খাওয়া' ইত্যাদি প্রাণহানি সংক্রান্ত প্রথাতে উচ্চবৃত্তীয়রা নিম্নবৃত্তীয়দের উৎসর্গ করেছে নানা রকম পুণ্যঅর্জন কামনার কাহিনী বা গল্পের মাধ্যমে। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো যথেষ্ট দুর্বল ফলত ভয় ও বিশ্বাসের নিরিখে অপার্থিব চাহিদার একটি নিদারুণ নিদর্শন এই চড়ক পূজা। আর একটি দিক হল বর্ণাশ্রম ভিত্তিক শ্রেণী সমাজের অন্তর্লিন দ্বন্দ্ব। প্রাণহানি নাশক এই সকল আদিম প্রথা যদি পালন করতেই হয় তবে হীন বংশজাত শ্রেণীর মানুষদের যুক্ত হওয়া শ্রেয়, উচ্চবিত্তরা থাকুক নিরাপদে তার জন্য যদি একদিন অন্ত্যজ শ্রেণীর কাছে একটু মাথা নোওয়াতে হয় তাতে এমন কিছু যাবে আসবে না, এই সামাজিক স্বার্থ বুদ্ধিদীপ্ত শ্রেণী গাজনের মূল সন্ন্যাসী পাটভক্ত্যা ইত্যাদি পথগুলি সর্বদা উন্মুক্ত রেখেছে সমাজের নিচু শ্রেণীর (ডোম, বাগদি, মুচি, কাহার, চামার প্রভৃতি) মানুষের জন্য। একমাত্র এই দিনেই তথাকথিত 'অন' জাতের হতভাগ্য মানুষগুলি শুদ্দুর সমকক্ষ বলে বিবেচিত হয় এবং হীন বংশজাত 'পাঠভক্তাকেও' ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা প্রণাম করেন এবং সকলে একত্রে বসে অন্ন গ্রহণ করার স্বীকৃতি পান।

চড়ক গাজন উৎসবের মূল উপাস্য দেবতা শিবকে পূজা করা হয় এর আক্ষরিক অর্থ হিসেবে বলা যায় যেহেতু শিব শ্মশানচারি এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ নন্দী-ভৃঙ্গী ও ভূত-প্রেতের দল, আদিম সংস্কার ও বিশ্বাস থেকে বহমান এই ধারণা বর্তমান শিক্ষিত সমাজে ও বহাল রয়েছে এবং লৌকিক বিশ্বাস মতে, গাজন অশৌচ পালনের অনুষ্ঠানই হোক বা প্রেতলোক জনিত কোন যাদুবিদ্যা অথবা অতি ভৌতিক ব্যাপারই হোক, মূল কাঠামোর ভিত্তিই হল আদিম সংস্কারে বশবর্তি আমরা প্রত্যেকে। জাগতিক পরিবর্তনের সঙ্গে ও ভিন্ন লোকায়ত ধারণা অনুযায়ী কাহিনী পরিবর্তন ঘটে মাত্র নিয়মের ও হেরফের হয়। বর্তমানে চড়ক উৎসবটি বিভিন্ন জায়গায় পালিত হলেও বহু নিয়মের পরিবর্তন ঘটেছে, আগুন ঝাঁপ, বাণফোঁড়া প্রভৃতি ধরনের প্রাননাশক খেলা বন্ধ হয়েছে; এছাড়া চৈত্র মাসে যে ছেলেছোকরার দল শিব, পার্বতী, ভুত-প্রেত সেজে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মাগন ভিক্ষা করত সে সব আজ বিলুপ্তির পথে, প্রত্যন্ত পাড়াগাঁ ছাড়া বহুরূপীর দল দেখা যায় না। গাজন উৎসবের আরও একটি সংস্কার কাকবলি বা ভুন্নুঘর অথবা রাত জেগে ঠাকুর চুরি এইসব কোনকিছুই আগের মতো নিয়ম মেনে পালিত হয় না; বলাবাহুল্য প্রথাগুলি উঠে গিয়েছে। বর্তমান সমাজের নবীন প্রজন্মরা এসকল সংস্কার থেকে অজ্ঞাত। আসলে নিয়ম মানুষের সৃষ্টি একটি উপাদান মাত্র যা মানুষই প্রয়োজনে তৈরি করে আবার কালান্তে তার সংযোজন বিয়োজন ঘটান; একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের কাছে অগ্রাধিকার পাচ্ছে সময়ের মুল্য, তবে অপার্থিব চাহিদার মূল নিহিত অর্থ সেই একই থেকে যাচ্ছে, সুস্থ সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন।

তথ্যসুত্র:

1. সেনগুপ্ত, পল্লব। 'পূজা পার্বণের উৎসকথা'। পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, পৃষ্ঠা- ২২৪।
2. তদেব, পৃষ্ঠা- ২২৫।
3. নস্কর, দেবব্রত (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকোৎসব গাজন ও সমাজ সংস্কৃতি) । 'জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা'। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ বিভাগ, পৃষ্ঠা- ৩২২।
4. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৪।
5. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩০।
6. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৫।
7. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৬।
8. সেনগুপ্ত, পল্লব। 'পূজা পার্বণের উৎসকথা'। পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, পৃষ্ঠা- ২২৬।
9. নস্কর, দেবব্রত (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকোৎসব গাজন ও সমাজ সংস্কৃতি) । 'জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা'। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ বিভাগ, পৃষ্ঠা- ৩২৭।
10. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩১।
11. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩২।